ইতিহাসের অতীত আজ ঘটমান বর্তমান হয়ে গেছে

সন্দীপ বন্দ্যোপাধ্যায়

স্বাধীনতার দিন হিন্দু-মুসলমানের মৈত্রী দেখে যাঁরা ভেবেছিলেন, এই দুর্ভাগা দেশে সাম্প্রদায়িক কলহের বোধহয় এবার অবসান হল, তাঁদের সে আশা ধুলিসাৎ হয়ে যায় কয়েক বছরের মধ্যেই। স্বাধীনতা-উত্তর এই উপমহাদেশে সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষ পুরাবস্তু নয়, শিলীভূত ইতিহাসও নয়, সেই ইতিহাসের প্রবাহ আজও রক্তের ধারার মতো গড়িয়ে চলেছে; মেরঠে-মোরাদাবাদে, ভাগলপুরে, ভিওয়ান্দিতে, সুরাতে-আমেদাবাদে; মুম্বাই-দিল্লীতে, এবং কখনও বা এই কলকাতা শহরেও।

বলা হচ্ছে, গুজরাতে যা ঘটছে, তা দাঙ্গা নয়, গণহত্যা, একটি সম্প্রদায়ের মানুষকেই সেখানে বেছে বেছে হত্যা করা হয়েছে; ধবংস করে দেওয়া হয়েছে তাঁদের ঘরবাড়ি, জীবিকার সংস্থান আর সম্পত্তি। এক হিসাবে স্বাধীনতা উত্তর ভারতে প্রায় প্রতিটি দাঙ্গার ইতিহাসই তাই। প্রাণহানি আর সম্পত্তি নাশ বেশি হয় সংখ্যালঘুদেরই। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের হিসেবে দেখছি, ১৯৮০-র দশকের প্রথম সাত বছরে বিভিন্ন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় নিহত হয়েছিলেন প্রায় ১৮০০ মুসলমান এবং ৭৫০ জন হিন্দু। সমানে সমানে সংঘর্ষ হলে মৃতের সংখ্যায় এতটা অসমতা থাকত না।

কিন্তু ওই একই পরিসংখ্যান থেকে পাওয়া আর একটা তথ্যও খেয়াল করার মতো। আহতদের মধ্যে হিন্দুরা সংখ্যায় বেশি--প্রায় ১০,৫০০জন, সেখানে মুসলমানের সংখ্যা ৮,৬০০-র মতো। এরপর ১৯৯০-এর দশকে আরও ভয়াবহ দাঙ্গা বা গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে। এক বার নয় বার বার। সেই সব হিংসাকান্ডের হিসাব নিলেও খতিয়ানটা বোধহয় একই রকম থেকে যাবে। প্রাণহানির সংখ্যা নিঃসন্দেহে সংখ্যালঘুদের মধ্যেই বেশি; তবে অন্য সম্প্রদায়ের মানুষও হতাহত হন। ভারতের সাম্প্রদায়িক গণহত্যার সঙ্গে বাংলাদেশের হিংসাকান্ডের একটা বড় পার্থক্য এইখানে। দাঙ্গাটা এখানে শু হয় কোনও এক পক্ষের দিক থেকে নয়; অপর পক্ষের একটা প্ররোচনা বা মারমুখী ভূমিকাও থাকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পারস্পরিক সংঘর্ষ পরিণত হয় এক বিরাট হত্যাকান্ডে সেখানে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হন সংখ্যালঘুরাই।

এই পরিণতি আমরা মেরঠে (১৯৮৭) দেখেছি, প্রথম দু'দিন দু'পক্ষই পরস্পরকে আত্রমণ করেছিল, মারা গিয়েছিলেন দুই সম্প্রদায়ের মানুষই। কিন্তু পরে একতরফা আত্রমণ হয় সংখ্যালঘুদের ওপর। ১৯৮৬-র আমেদাবাদ, ১৯৮৯-র ভাগলপুর, ১৯৯৩-এর মুম্বাই আর আজকের গুজরাতেও ঘটনাত্রমটা প্রায় একই রকমের। মুম্বাইয়ের যোগেশ্বরীতে প্রথম দিন চার জন হিন্দুকে পুড়িয়ে মারা হয়েছিল; এ বারে গুজরাতেও তা-ই ঘটল, আরও বড় রকমের। নৃশংস ভাবে হত্যা করা হল ৫৮ জন রামসেবককে। আর হিন্দুরা তার শোধ তুলে নিল অন্তত কুড়িগুণ বেশি মুসলমানকে হত্যা করে, জ্যান্ত পুড়িয়ে মেরে, হাজার মানুষকে নিঃস্ব, নিরাশ্রয় করে দিয়ে। এক মাসেরও বেশি হয়ে গেছে, এখনও তাঁরা ঘরে ফিরতে পারছেন না। ত্রাণ-শিবিরে প্রয়োজনীয় সাহায্যও পাচ্ছেন না। মহাত্মার দেশে আজ হিংসার মারি, মৃত্যুর মড়ক; দেশ চালাচ্ছে একটা নির্লজ্জ, নির্দয় সরকার।

কিন্তু যাঁরা বলছেন, এ রকম বীভৎস ঘটনা এর আগে কখনও ঘটেনি, তাঁরা বোধহয় ইতিহাসটা একটু ভুলে যাচ্ছেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে চিহ্নিত করে নিয়ে আত্রমণ এর আগে মেরঠে হয়েছে, ভাগলপুর, সুরাতেও হয়েছে। পুলিশ নিষ্ক্রিয় থেকেছে বা নিজেরাই ঘর জ্বালিয়েছে, মানুষ খুন করেছে--তা-ও এই প্রথম নয়। মেরঠে হিন্দু ব্যবসায়ীরা প্রভিনশিয়াল আর্মড কনস্ট্যাবুলারিকে (পি এ সি) তাদের বাড়ির ছাদে জায়গা করে দিয়েছিল, যাতে তারা অপর সম্প্রদায়ের বস্তির

ওপর ভাল করে গুলি ছুঁড়তে পারে। ১৯৮৪ সালে দিল্লিতে শিখগণহত্যার সময় পুলিশকে বলতে শোনা গিয়েছিল; ৩৬ ঘন্টা সময় দিচ্ছি, যা পারো করে নাও। ভাগলপুর হত্যাকান্ডযখন চলছে, সেই সময় টেলিগ্রাফ পত্রিকায় একটি সংবাদ-শিরোনাম ছিল এ-রকম 100 butchered in Bihar as police stand guard (৩.১১ .১৯৮৯)। এই শিরোনামটাই আজ তুলে এনে গুজরাতে বসিয়ে দেওয়া যায়; শুধু ১০০-র পরে আর একটা শূন্য যোগ করতে হবে। আগুনে-পোড়া, বীভৎস ঝলসানো দেহের যে ছবিগুলো আমরা মার্চ মাসে কয়েক দিন ধরে কাগজে দেখল াম, ঠিক সেই রকম ছবিই দেখেছিলাম ১৯৮৯-র অক্টোবর-নভেম্বর মাসে।

এ বারের গুজরাতে আদিবাসী আর দলিতরা হিংসাকান্ডে যোগ দিয়েছে বলে কেউ কেউ উদ্বিগ্ন বোধ করেছেন। এই মার াত্মক প্রক্রিয়াটাও লক্ষ করা যাচ্ছে গত পনেরো-কুড়ি বছর ধরে। দিল্লির শিখহত্যায় ভাঙ্গি জনগোষ্ঠীকে কাজে লাগানো হয়েছিল। মজফ্‌রনগরের দাঙ্গায়(১৯৮৮) যোগ দিয়েছিল বাল্মীকরা, মেরঠেও একটা আক্রমণাত্মক ভূমিকা ছিল দলিতদের। হিন্দুরা যাদের মানুষের মর্যাদা দেয়নি, তাদের একাংশ আজ হিন্দুত্ব রাজনীতির সহায়, তারাও হাত লা গিয়েছে ঘর জ্বালানো আর মানুষ মারার কাজে; ও দিকে উত্তরপ্রদেশে বিজেপি-র সঙ্গে বিএসপি-র গাঁটছাড়া। এই হল র াজনীতি। আত্যন্তিক ঘৃণা ছাড়া আর কিছু এর প্রাপ্য হতে পারে না।

ঘৃণা করি সেই সংখ্যালঘু উন্মত্ততাকেও, যা একটা ভয়ানক কান্ডঘটিয়ে পরিস্থিতিকে আরও উত্তেজক করে তোলে, আর নিজের সম্প্রদায়ের মানুষকেই ঠেলে দেয় আগুন, বোমা আর গুলির মুখে। এরাই তো রথযাত্রার ওপর ঢিল ছুঁড়েছিল অ ামেদাবাদে, দলিত বস্তি জ্বালিয়েছিল ভাগলপুরে, পুড়িয়ে দিয়েছিল শ্রমিক বস্তি, কলকাতার মেটিয়াবুজে (১৯৯২)। এর াই মানুষসুদ্ধ ট্রেনের কামরা পুড়িয়েছে গোধরায়। কারা করে এ সব কাজ? তাদেরই কেউ কেউ আবার পরে নির্বাচনে র াজনৈতিক প্রার্থী হয়ে যায় কেমন করে?

অনেকেই হয়তো এইসব প্রসঙ্গ পছন্দ করবেন না, কারণ তা হলে তাঁদের সেকুলার ভাবমূর্তি ক্ষুন্ন হবে। কিন্তু এই আতঙ্কবা তিক সেকুলার রাজনীতি কার্যত সংখ্যালঘুদের ক্ষতিই করেছে। ভারতে মুসলমানদের যেমন সন্দেহের চোখে দেখা হয়, ত াদের একাংশের কিছু কিছু আচরণ এই সন্দেহকে জিইয়ে রাখতেও সাহায্য করে। কিছু দিন আগে বিন লাদেনের জয়ধবনি দিয়ে যারা কলকাতায় মিছিল বের করেছিল,তারা তাদের সম্প্রদায়ের ক্ষতি করেছে--এই অপ্রিয় সত্য কথাটা বলা দরক ার, সংখ্যালঘুদের স্বার্থেই। মনে রাখা ভাল, ১৯৯২ সালে মেটিয়াবুজের পর ট্যাংরায় যখন মুসলমান বস্তি পুড়ে ছাই হল, তখন কিন্তু বামপন্থী সরকার তাদের বাঁচাতে পারেনি।

অবশ্য কেউ যদি আজ বলেন, পুরনো কথা আর শুনতে চাই না, তাঁকে দোষ দেওয়া যায় না। ধারাবাহিক হিংসা আর বর্বরতার কাহিনী শুনতে শুনতে আমাদের স্নায়ু অসাড় হয়ে গেছে; কিন্তু হিংসার কোনও ক্লান্তি নেই। দেশবিভাগের পঞ্চ ান্ন বছর পরেও মানুষ আবার গৃহচ্যুত হচ্ছেন, স্বভূমে বাস করতে ভয় পাচ্ছেন। স্বাধীনতার পঞ্চাশ বছর পূর্তি উপলক্ষে দেশবিভাগ আর তার মানববিপর্যয়ের ছবিগুলো আবার নতুন করে ছাপানো হয়েছিল, প্রায় সেই রকম ছবিই আমরা এখন দেখছি প্রতিদিনের সংবাদপত্রে।

তণ প্রজন্ম যাকে ইতিহাস বলে জেনেছিল, সেই ইতিহাসের অতীত আজ ঘটমান বর্তমান হয়ে গেছে।

সৃষ্টিসন্ধান
Phone: 98302 43310
email: editor@srishtisandhan.com